OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 149
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 140 - 149
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন

অনন্যা ঘোষ
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : gananya863@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Tradition, Written and Oral traditional elements, Poetry, Evaluation of traditional elements, Post-independence, Socio-Political Degeneration, Political exploitation, Globalization.

Abstract
Tradition is a subject, that flows parallely with most of the ancient civilization of world. It describes the story of rise and fall of a civilization. It is deeply connected to the root of culture. The ideology of art is to evolve itself by accepting the tradion. From the very early period, ancient writers of Indian literature proudly accept the traditional elements of civilization in their respective creation. Not only in India, but also in Western literature poets and writers had used the elements of Greek mythology and other ancient oral and written traditional elements in a new perspective. Even in the degenerative time period after the world war, the flow remains same. Sankhya Ghosh is a renowned poet of Modern Bengali poetry in 5th decade of 20th century. His intellectual statements became so acceptable to the readers. In the post-independence era of Bengali literature partition of country, problem of refugees, unemployment, destruction of morality affects the mindset of the young poets and they tried to find a new way, ignoring the traditional flow but the poet Sankhya Ghosh was one, who became an exceptional example by using the traditional elements of our civilization in his own way, He just accepts the essence of Indian and Western traditional elements through his own knowledge and experience. It not only expresses his great knowledge of tradition and intellect but also his deep respect and pride for tradition. He uses the elements of myrthology, Puranas and Epics in a new suitable manner in modern time period. In the post-colonial era of India people had experienced socio-political disaster several time. People in this modern period lead themselves to the destination of void by their self-destructive activities. The poet has wanted to regenerate their suppressed moral sense by creating a pictorial view of glory and failure of past. He also inhales the essence of Indian ancient philosophy through his feelings and express it brightly in his poetry.

Discussion

ভারতীয় সভ্যতার বয়স সুপ্রাচীন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে তার উত্থান-পতন, গৌরব-লজ্জার ইতিবৃত্ত, যা আবহমান কাল ধরে গ্রন্থিত হয়েছে আমদের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সঙ্গে। 'ঐতিহ্য' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ইতিহাস+য থেকে। 'ঐতিহ্য' হল পরম্পরাগত ভাবে প্রচলিত চিন্তা, বিশ্বাস বা কাহিনি, যার মূল নিহিত রয়েছে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 149
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সংস্কৃতির অভ্যন্তরে। প্রাক-স্বাক্ষর সময় পর্ব থেকে সমাজে প্রচলিত মিথ, উপকথা, জনশ্রুতি ইত্যাদি মৌখিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত। অন্যদিকে লিখিত ঐতিহ্য ধারণ করে রয়েছে পুরাণ, মহাকাব্যের কাহিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনিগুলি কালের নিয়মে বিবর্তিত হয়েছে অনেকক্ষেত্রে।

ঐতিহ্যকে স্বীকার করে উত্তরণের পথে অগ্রসর হওয়াই ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ভবভূতি, কালিদাসের মত কবিরা ঐতিহ্যকে স্থান দিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। শুধুমাত্র ভারতীয় সাহিত্য নয়; পাশ্চাত্য সাহিত্যে মিল্টন, ভার্জিল প্রমুখ মহাকবিরা ধর্মতত্ব-মহাকাব্য থেকে গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাব্যের উপাদান। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বন্ধ্যা পৃথিবীর কবি টি.এস.এলিয়টও বলেছেন ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না; তাঁকে গ্রহণ করতে হয় মননশীলতায়—

> "Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour."[১]

শুধুমাত্র পাশ্চাত্য নয়; সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে এলিয়ট স্থান দিয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর কালজয়ী 'The Wasteland' কাব্যে বাইবেলের প্রসঙ্গের পাশাপাশি উঠে এসেছে বেদ-উপনষদের অনুষঙ্গ।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যপর্বের ঐতিহ্যানুসরণকে অবলম্বন করে আধুনিক সাহিত্যেও স্থান করে নিয়েছে জাতির অতীত গৌরব ও ব্যর্থতার কাহিনি। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের সূত্রে আগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তাধারা মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উদ্দীপিত করেছে তাঁদের সৃষ্টিতে ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নে। আধুনিক কবিতার পর্যায়েও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের কবিতায় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংশয়াধীন, অস্থির ও বিপন্ন পৃথিবীর চিত্র প্রকাশিত হয়েছে গ্রিক ও ভারতীয় মিথ-পুরাণের রূপকের আশ্রয়ে।

সময়ের প্রেক্ষিতে শঙ্খ ঘোষকে পাঁচের দশকের কবি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বহু গণসংগ্রামের পর স্বাধীনতা অর্জন করলেও সেই স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি ভারতবাসীর। সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতা একই সঙ্গে বহন করে এনেছিল দেশভাগের যন্ত্রণা, স্বাধীন দেশের সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা, দারিদ্র, অর্থনৈতিক বৈষম্য, খাদ্যসংকট, যা অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছিল পাঁচের দশকের তরুণ কবিমনকে। সামাজিক আদর্শের অবক্ষয় লক্ষ্য করে গড়ে তুলেছিলেন এক নিজস্ব সৃষ্টির জগত, যেখানে সমাজবাস্তবতা ও তার প্রতিক্রিয়ার বদলে ব্যক্তিগত উচ্চারণে আত্মোপলব্ধিকেই স্থান দিয়েছিলেন তাঁরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার গ্রহণ করে বাংলা কাব্যজগতে পদার্পণ করলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তাঁর কবিতার বৌদ্ধিক ও মননশীল উচ্চারণ সৃষ্টি করল এক স্বতন্ত্র ঘরানা। তাঁর মৃদু অথচ তীব্র উচ্চারণ মানুষকে সম্মুখীন করল আত্মসমীক্ষণের দর্পণের।

পাঁচের দশকের কবিদের কবিতায় যখন শোনা গিয়েছে ঐতিহ্য অস্বীকারের দুঃসাহসী উচ্চারণ, তখন একই প্রেক্ষাপটে দণ্ডায়মান কবি শঙ্খ ঘোষ মিথ-পুরাণ-মহাকাব্যের অনুষঙ্গ গ্রহণ করেছেন যুগযন্ত্রণার প্রেক্ষিতে। তাঁর কবিতায় নবনির্মাণ করেছেন পরম্পরাগত ইতিবৃত্তের। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গে বিধ্বস্ত মানুষ ও উদ্বাস্তুদের শিকড় হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা। এই কাব্যের 'কবর' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে জীবনের শেষলগ্নে পৌঁছে আত্মকেন্দ্রিক মানুষের নির্বেদ। বীর্যহীন মানুষের স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কবি। বৃথাই নিজের জীবন এতদিন আগলে রেখেছেন তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চাননি কবি। পুরাণে ঋষি দধিচী যেঁভাবে আত্মবলিদানের মাধ্যমে দেবতাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অশুভ শক্তির বিনাশ করে মুক্তি লাভের আয়ুধ, তেমনই কবিও নিজের জীবনদানের মাধ্যমে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে চান ভবিষ্যত প্রজন্মের সম্মুখে-

> "কুণ্ডলিত রাত্রিটা আজ যাবার সময় বলল আমায়
> 'তুমিই শুধু বীর্যহারার দলে,
> ঋজু কঠিন সব পৃথিবী হাড়ে-হাড়ের ঘষা লেগে

অক্ষমতা তোমার চোখের পলে।'
নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা-
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।"[২]

'তুমি তো তেমন গৌরী নও' (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যের 'ভিখারী বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও' কবিতাটিতে দেবী ভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাশীখণ্ডে বর্ণিত দেবী অন্নপূর্ণার কাহিনিটি ভিন্নরূপে গ্রহণ করেছেন কবি। জগতের সমস্ত অন্ন হরণ করে মোহিনীরূপ ধারণ করে শিবকে বাধ্য করেছিলেন অহং ত্যাগ করে তাঁর শরণাপন্ন হতে। আধুনিক পৃথিবীতেও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিযোগিতায় বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিও কুক্ষিগত করেছে সমস্ত সম্পদ। বাহ্যিক জৌলুসের ছটায় প্রভাবিত করেছে আমাদের মেধা ও হৃদয়কে। ভয় ও প্রলোভনের বশে গ্রাস করতে চায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজস্ব উৎপাদনশীলতা। পৌরাণিক কাহিনির কল্যাণবোধ এখানে অনুপস্থিত। তাই কবি বলেন-

"জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দিন দিনে চাও পদতলে
ভিখারী বানাও, কিন্তু মনে মনে জানেনি কখনো
তুমি তো তেমন গৌরী নও"[৩]

একই কাব্যের 'জলস্রোত' কবিতাগুচ্ছের 'আরুণি-উদ্দালক' কবিতাটি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ির ভয়ঙ্কর বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

"দেশের এ-প্রান্তের সঙ্গে ও-প্রান্তের কি মর্মের যোগ আছে কোনো? হয়তো আজই এসে পৌঁছালাম বলে এ- বৈপরীত্য এমন কঠোর হয়ে লাগছে চোখে, তা নইলে তো আমারও বোধে আসত না এত অসংগতি! কীভাবে তবে বাঁচব আমরা? কোথায় আমাদের ভুল? শহরের এই আনন্দচ্ছবি দেখতে পাই। দেখে এসেছি প্রবাসী মানুষদের কারো কারো অকরুণ নিস্পৃহতা। তিস্তার বাঁধ ভেঙে গেছে। আরো আগে ভেঙে গেছে আমাদের সর্বস্বের বাঁধ।"[৪]

তিস্তার বাঁধ ভেঙে প্রবল প্লাবনে উত্তরবঙ্গে যখন মর্মান্তিক পরিস্থিতি, মানুষ যখন অসহায় হয়ে সাহায্যের প্রতীক্ষায় অনবরত যুদ্ধ করে চলেছে প্রকৃতির সঙ্গে, ঠিক সেই সময়ে নাগরিক সভ্যতার প্রতিভূ কলকাতা নগরী দীপাবলিতে সেজে উঠেছে আলোর মালায়। বিপর্যয়ের ভোরে শুধুমাত্র ত্রাণ পাঠিয়ে দায়ভার মুক্ত হতে চায় তারা। নাগরিক মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা কবিকে স্মরণ করিয়েছে মহাভারতের আদিপর্বের আরুণির কথা। গুরু ধৌম জ্ঞানার্থী আরুণিকে ক্ষেত্রে আল বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে জ্ঞানার্থী আরুণি কর্মযোগীতে রূপান্তরিত হলেন। নিজেই শুয়ে পড়লেন আলে। গুরুর আশীর্বাদে তাঁর নব পরিচয় হল 'উদ্দালক' রূপে। কবি দেখেছেন, আধুনিক সভ্যতায় আত্মকেন্দ্রিক মানুষের জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে রয়েছে সংযোগের অভাব। তাই তিনি এযুগে সন্ধান করেছেন আরুণির, যে প্রকাশ করবে, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় –

"তোমার সমগ্র সত্তা যতক্ষণ না - দাও আমাকে
ততক্ষণ কোনো জ্ঞান নেই..."[৫]

'জাবাল সত্যকাম' কবিতায় পৌরাণিক কাহিনির অন্তরালে ধরা পড়ে আধুনিক মানুষের আত্মপরিচয়ের সংকট। বিশ্বায়নের সময়পর্বে আমরা সকলেই ব্যক্তিগত পরিসীমা ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম। তবুও ছান্দোগ্য উপনিষদের

চতুর্থ প্রপাঠক-এর সত্যকামের কাহিনির মত আমরা গোত্র পরিচয় থেকে ছিন্নমূল হয়ে ভাসমান। ছিন্নমূল মানুষগুলিকে প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয় আত্মপরিচয় সন্ধানের যন্ত্রণা।

'আদিম লতাগুল্মময়' কাব্যের কবিতাগুলির রচনার সময়কাল ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। 'মুক্তির দশক' হিসাবে পরিচিত এই সময়কালে সমগ্র দেশ প্রত্যক্ষ করেছিল সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনীতির নগ্নরূপ ও প্রশাসনিক আগ্রাসনের ভয়ঙ্করতা। 'যাদব' কবিতায় রয়েছে মহাভারতের 'মৌষল পর্ব'–এর অনুষঙ্গ। আত্মধ্বংসের লীলায় মত্ত যাদব বংশের সন্তানেরা অস্ত্র ধারণ করেছিল একে অন্যের বিরুদ্ধে। আলোচ্য কবিতায় কবি পরিলক্ষিত করেছেন, বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে পরাধীনতার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেয়েছে দেশ কিন্তু আভ্যন্তরীন হিংসা অব্যহত রয়েছে। আত্মস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে অপরকে ধ্বংস করে দিতে মুহূর্তের জন্য ভাবছে না মানুষ—

"পলকে পলকে ছিল অপমান, মনে করে দেখো
সহজে চেয়েছ ত্রাণ
তোমাদের হাতে ছিল হাড়ভাঙা দলীয় নিশান
এইবার সময় সাত্যকি
সব শেষ হয়ে যাবে, সমস্ত যাদব বংশ, যে-কোন সবুজ ঘাস
হাতে নিলে হয়ে ওঠে মুষল মুদ্গর ধ্বংসবীজ।"[৬]

'মণিকর্ণিকা' কবিতায় রয়েছে ভারতীয় তত্ত্ব দর্শনের প্রসঙ্গ। নদীর দুই কূল বলে জীবন ও মৃত্যু – এই দুই বিপরীত বোধের কথা। মাঝখানে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা। সমগ্র জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে পরপারের পথে যাত্রা করে মানবাত্মা। ইন্দ্রিয়-বোধশূন্য হয়ে অর্জিত কর্মফলে নিরাসক্তির মাধ্যমে মোক্ষের দিকে অগ্রসর হওার প্রসঙ্গ বয়ে আনে চর্যাপদের স্মৃতি, যেখানে ডোম্বীরমণী হয়ে ওঠে আত্মা ও পরমাত্মার যোগসূত্র—

"গঙ্গা জউণা মাঝাঁরে বহই নাই।
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গি পোইয়া লীলে পার করেই।।"[৭]

একই ভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যায় কবির কণ্ঠে—

"দিনের বেলা যাকে দেখেছিলে চণ্ডাল
আর রাত্রিবেলা এই আমাদের মাঝি
কোনো ভেদ নেই এদের চোখের তারায়।"[৮]

'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। এই সময় পর্বে মানুষ সাক্ষী থেকেছে নকশালবাড়ির রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও জরুরি অবস্থাকালীন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার। এই কাব্যের 'বাবরের প্রার্থনা কবিতায় ইতিহাস কথিত মিথ একাত্ম হয়ে গিয়েছে কবির ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনুভূতির সঙ্গে। ইতিহাসে জনশ্রুতি রয়েছে, ঈশ্বরের কাছে আত্মজীবন দানের পরিবর্তে মৃত্যুপথযাত্রী তরুণ পুত্র হুমায়ুনের প্রাণ ভিক্ষা করেছিলেন ভারত সম্রাট বাবর। অতীতের ইতিবৃত্তকে আধুনিক সময়ের পরিসরে গ্রহণ করেছেন কবি। সাতের দশকের মুক্তির স্বপ্নকামী একদল তরুণকে অকালে ঝরে যেতে হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে। তাদের ভবিষ্যত ধাবিত হয়েছিল এক অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে। সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে সমাজের অভিভাবকস্থানীয় সত্তা হিসাবে কবি বাবরের মতই আত্মধ্বংসের বিনিময়ে তরুণদের হাতে তুলে দিতে চান এক সুস্থ, সুন্দর, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত-

"এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম/ আজ বসন্তের শূন্য হাত-/ ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও/ আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 149
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'আরব্য রজনী'-র কাহিনিতে হাতেম তাই পরিচিত ছিলেন দানশীল মহাত্মারূপে। কিন্তু কবি শঙ্খ ঘোষ এই কিংবদন্তীকে ব্যবহার করেছেন ব্যঙ্গাত্মক আঙ্গিকে। দানশীল শাসক হাতেম তাই প্রজার কল্যাণের স্বার্থে বহু আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শাসকের স্বৈরাচারী আচরণ কবি লক্ষ্য করেছেন জরুরি অবস্থার সংকটকালীন সময়ে। আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে রাষ্ট্রীয় শক্তি হস্তক্ষেপ করেছে মানুষের স্বাধীনতায়, কেড়ে নিয়েছে তার মৌলিক অধিকার। জনগণ নীরবে মেনে নিয়েছে শাসকের স্বৈরাচারীতা। তাদের মেরুদণ্ডহীনতাকে আঘাত করে কবি লেখেন-

"হাতের কাছে ছিল হাতেম তাই
চুড়োয় বসিয়েছি তাকে
দু-হাত জোড় করে বলেছি 'প্রভু
দিয়েছি খত দেখো নাকে
দেখি না বরাতে যা থাকে-
আমার বাঁচামরা তোমারই হাতে
স্মরণে রেখো বান্দাকে!' "[১০]

উপনিষদের নচিকেতার কাহিনি কবি গ্রহণ করেছেন পরিবর্তিত মূল্যবোধের সাপেক্ষে তাঁর 'নচিকেতা' কবিতায়। নচিকেতার পিতা ঋষি রাজশ্রবা বৈষয়িক দ্রব্যকে আহুতি দিয়েছিলেন যজ্ঞে কিন্তু পুত্রকে সমর্পণ করেননি। কৌতূহলী বালক নচিকেতা যাত্রা করে যমপুরীতে। মৃত্যুর অধীশ্বরের কাছ থেকে সে জেনে নেয় জীবন-মৃত্যুর রহস্য, আত্মার কথা ও দুঃখ নিবারণের উপায়। সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে মানুষ যখন আত্মজ্ঞানের অভাবে চলেছে অন্ধকারের দিকে, সেই পর্বে সমস্ত কর্ম, অনুভূতির আহুতি প্রদান করে কবি আহ্বান করেছেন নচিকেতার মতো কোন এক চরিত্রকে, যে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে দৃষ্টিহীন, বধির সমাজের হাতে তুলে দেবে আত্মবোধের অভিজ্ঞান।

'বন্ধুরা মাতি তরজায়' কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছে জরুরি অবস্থার সমকালীন সময় বা তার পরবর্তী পর্যায়ে। রাষ্ট্রীয় শক্তি হরণ করেছে জনগণের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। কণ্ঠরোধ করা হয়েছে সংবাদপত্রের, কেড়ে নেওয়া হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের স্বাধীনতা। পুরাণের অগস্ত্য যাত্রার কাহিনির রূপকে এই সংকটকালীন অবস্থার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 'অগস্ত্যযাত্রা' কবিতায়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রশাসনিক শান্তিরক্ষার অজুহাতে জনগণের জীবনযাপনে জারি করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। মান-অপমান বোধশূন্য জনগণ বিন্ধ্য পর্বতের মতই নতি স্বীকার করে নিয়েছে এই অন্যায়ের সামনে-

"... আর কটা দিন থাক না ভাই
আগে মৌচাক নাবাই
তারপরে মান ফিরিয়ে দেব সমস্ত।'
তাই শুনে আজ বিন্ধ্যরাজ
লাস্যে হলেন দিলদরাজ
গুগলি-শামুক দেখলে ভাবেন নমস্য"[১১]

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কালকেতুর কাহিনিকে গ্রহণ করেও কবি তুলে ধরেছেন জরুরি অবস্থার বিপন্ন কালপর্বএর চিত্র 'চণ্ডীমঙ্গল' কবিতায়। মঙ্গলকাব্যের কালকেতু কবির কাছে ধরা পড়েছে সরল ও সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরূপে। তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বা প্রতারিত করে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করেছে দেবতা বা ষড়যন্ত্রকারীরা। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কবি রচনা করেছেন আলোচ্য কবিতাটি। সাধারণ মানুষের চেতনাকে সুপ্ত করে রেখে দিতে চায় দেশের শাসকশক্তি। প্রলোভন দেখিয়ে, ভয় সঞ্চার করে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর দমন করে রেখে দিতে চায়। সমগ্র জীবনকে গ্রাস করে নিতে চায় ক্ষমতার দম্ভে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 149
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' কাব্যের 'জতুগৃহ' কবিতায় সত্তরের দশকের রক্তাক্ত সময়ের উত্তরপর্বে রচিত। নকশালবাড়ির আন্দোলনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জরুরি অবস্থার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সমাজকে পরিণত করে করেছিল জতুগৃহে। মহাভারতের আখ্যানে মন্ত্রী পুরোচনের সহায়তায় জতুগৃহে পাণ্ডবদের দাহ করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র রচনা করেছিলেন দুর্যোধন কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তবে সমকালীন সময়ে দেশজোড়া জতুগৃহে ভবিষ্যতহীন, দিশাহারা যুবসমাজ নির্গত হতে পারছে না যুগের অলাধচক্র থেকে। এই সংকটে বিদুরের মতো পথপ্রদর্শক নেই কোথাও—

"মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি লাক্ষা
কোথাও ধর্ম কোথাও রাজ্য
চর্বিতে শণে তেলে আর কাঠে
ঘৃণা-বিচ্ছেদে দলে-উপদলে
স্ফুলিঙ্গপাতে সহজে দাহ্য-
বিদুরেরা শুধু নেই কোথাও।"[১২]

'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থটির অন্তর্গত কবিতাগুলি রচিত হয়েছে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে। বিশ্বায়নের সূত্রে অর্থনীতির উদারীকরণের প্রভাবে পণ্যায়নের সংস্কৃতি গ্রাস করেছে সমগ্র সমাজকে। বাজার অর্থনীতি, বিজ্ঞাপনের জৌলুস মানুষকে করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন এবং গ্রাস করেছে মানুষের মেধা ও মননকে। প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ তাঁর 'মেট্রোপলিটন মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ' গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন ও মন' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "মানুষ বাড়ছে তাই প্রয়োজন বাড়ছে। কাজেই বিজ্ঞাপন বাড়ছে। যদিও যাদের জন্য আসলে বিজ্ঞাপনের এত বৈচিত্র্য তারা তেমন বাড়ন্ত নয় অর্থাৎ জনসমাজের বিনা প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন বাড়ছে, কারণ প্রয়োজন বাড়ছে বলে নয়, প্রয়োজন বাড়ানো হচ্ছে বলে, প্রয়োজন সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তাই। অনাবশ্যক প্রয়োজন বৃদ্ধিতে ধনবাদী সমাজের বেঁচে থাকার শেষ প্রয়াস তাই বিজ্ঞাপনবৃদ্ধি এবং বিজ্ঞাপনের অত্যাশ্চর্য ব্যয়বৃদ্ধি কেবল অঢেল সমাজে নয়, অন্যান্য উন্নতিশীল অনটনসমাজেও।"[১৩]

উক্ত কাব্যের 'হেতালের লাঠি' কবিতায় মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের পরিচিত প্রেক্ষাপট গ্রহণ করে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক আগ্রাসনের চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর ও মনসার দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির বিপক্ষে উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিষবাষ্প মনসার মতোই বিনষ্ট করতে চাইছে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব। কবিতায় 'হেতালের লাঠি' জ্ঞান ও বোধের প্রতীক, যাকে সম্বল করে চাঁদ সদাগরের মতোই সমাজের পিতৃস্থানীয় সত্তারূপে কবি সুরক্ষিত করতে চান দেশের আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যত ও মেধা —

"হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
শিয়রে কুণ্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।"[১৪]

একই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'হেতাল' কবিতাগুচ্ছের 'বশংবদ' ও 'লজ্জা' কবিতাগুচ্ছের আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব' কবিতায় কবি গ্রহণ করেছেন মহাভারতের প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতা অর্জনের পর অতিবাহিত হয়েছে সুদীর্ঘ সময়, তবুও যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল ভারতবাসী তা অধরা থেকে গিয়েছে। আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে বারবার আলোড়িত হয়েছে আসমুদ্রহিমাচল। খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, আসামে ভাষা সন্ত্রাস ও তার প্রতিরোধ চোখের সামনে জাগ্রত করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্মৃতি। শাসকশক্তির আগ্রাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মেধা ও মূল্যবোধ,

কুক্ষিগত হয়েছে তাদের স্বাধীন জীবন ধারণের অধিকার। মহাভারতের 'সৌপ্তিক পর্ব'-এ অশ্বত্থামা যেমন যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে রাত্রের অন্ধকারে হত্যা করেছিলেন সুপ্ত পাণ্ডব পুত্রদের, সেভাবেই সমগ্র ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছে নিয়ম শৃঙ্খলাহীন অরাজকতা। অন্ধকারময় সময়ে জেগে উঠেছে অশ্বত্থামার মতো ষড়যন্ত্রকারীরা, যারা তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে দিচ্ছে ধ্বংসের পথে। সত্য, বিশ্বাস, সহযোগিতা আজ প্রহসন, দেশের নেতৃবর্গ আজ দলীয় রাজনীতির স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। কবির ভাষায়—

> "মহাভারতের পাতা থেকে উঠে আসছে ছেলেবেলায় পড়া
> সৌপ্তিক পর্ব।।
> এই তোমার পায়ের কাছে এনে দিয়েছি বহুজনের শাঁস
> বলো এবার কোন্ দিকে যাব।"[১৫]

সময়টা ছিল ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের বর্ষ। এই বছরেই নয় কাঠা জমি নিয়ে সমস্যার জেরে বিহারের আরওয়ালের গান্ধীমাঠে তিনদিক ঘিরে তেইশজনকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। এর পশ্চাতে ছিল সামন্ত ও ভূমি সেনাদের প্রচ্ছন্ন মদত। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করে দেওয়ার নৃশংসতা কবিকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঘটে যাওয়া জালিওয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি। 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে কবি লিখেছেন —

> "আগস্ট মাসে এক সন্ধ্যাবেলা, কলেজ থেকে ফিরবার পথে, মনে পড়ল হঠাৎ গীতার প্রথম লাইন। আর তার 'সমবেত' শব্দটা পর্যন্ত পৌঁছেই যেন দেখতে পেলাম এক সমাবেশের ছবি, আরওয়ালের গান্ধীমাঠ। হ্যাঁ, মনে হল সেও এক ধর্মক্ষেত্র। মনে পড়ল ভূমিসেনা ব্রহ্মর্ষিসেনা লোরিকসেনাদের নাম। মনে হলো, অন্ধ, অন্ধ, ইতিহাসকে যে দেখতে পায় না সে তো অন্ধই।"[১৬]

এই প্রেক্ষিতে কবি শঙ্খ ঘোষ রচনা করেছিলেন 'ধূম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যের 'অন্ধবিলাপ' কবিতাটি। রাষ্ট্রের শাসকশক্তি ধৃতরাষ্ট্রের মতোই অন্ধ। এই অন্ধত্ব অধর্মের, ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করার। রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় তিনি জন্ম দিয়েছেন হাজার হাজার দুর্যোধনকে, যারা বিনা রক্তপাতে সামান্যতম ভূমিও ছাড়বে না। মহাভারতের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যের মতো ভূস্বামী, ভূমি সেনা, পুলিশবাহিনী সমস্তই তাঁর অধীন। তাই নিরস্ত্র, নিরন্ন, ভূমিহীনদের রক্তে বারবার ভিজবে মাটি। তবে একেই কবি শেষ বলে মনে করেননি। মহাভারতের মতো অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের জয় সূচিত হবে স্বাধীন ভারতবর্ষেও। একুশ শতক বয়ে আনবে নব জীবনের বার্তা—

> "কিসের ধ্বনি জাগায় দূরে দিকে এবং দিগন্তরে
> দেবদত্ত পাঞ্চজন্য মণিপুষ্পক পৌণ্ড্র সুঘোষ
> শেষের সে-রোষ ভয়ংকরী সেই কথাটা বুঝতে পারি
> কিন্তু তবু অন্ধ আমি, ব্যাসকে তো তা বলেইছিলাম
> বলেছিলাম এতাই গতি, ভবিতব্য এটাই আমার
> আমার পাপেই উশ্‌কে উঠবে হয়তো-বা সব ক্ষেত বা খামার
> আমার পাপেই উশ্‌কে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
> জমছে এসে শস্ত্রপানি বলোআমায় হে সঞ্জয়"[১৭]

'লাইনেই ছিলাম বাবা' কাব্যের রচনাকাল ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই কালপর্বের মধ্যেই দেশে ঘটে গিয়েছে অর্থনীতির উদারীকরণ, মাথা চাড়া দিয়েছে ধর্মীয় মৌলবাদ, দেখা গিয়েছে ধর্মকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা। ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশের বুকে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ঘটনা নেমে এসেছে কলঙ্কিত অধ্যায় রূপে। 'দুর্যোধন' কবিতায় দেখা যায়, মহাভারতের 'উদ্যোগ পর্ব'- এ দুর্যোধন যেমন নিরস্ত্র নারায়ণ নয়;

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 149
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রার্থনা করেছিলেন নারায়ণী সেনা তেমনই সমকালীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রশক্তি ধর্মের পরিবর্তে প্রার্থনা করেছে ক্ষমতার, যার দর্পে তারা মুছে দিতে চায় সমস্ত ঐতিহ্য-ইতিহাস। দলীয় রাজনীতির স্বার্থে তারা গড়ে তুলেছে বিচার-বুদ্ধিহীন অন্ধ অনুগামীর দল, যারা ধ্বংসের নেশায় মত্ত—

"নারায়ণ নয় আমি পেয়ে গেছি নারায়ণী সেনা
যতদূর যেতে হয় যায় এরা, কখনো আসে না
কোনো কূটনৈতিক তর্ক নিয়ে। ভাবলেশহীন
ধ্বংস হাতে ছুটে যায়। যদি বলি দিন এরা বলে দেয় দিন
যদি বলি রাত, বলে রাত।"[১৮]

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর একাধিক কবিতায় ভারতীয় মিথ, পুরাণ, মহাকাব্যের প্রসঙ্গের নবমূল্যায়ন করেছেন, তুলনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের ঐতিহ্যগত উপাদানের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় স্বল্প। 'সমস্ত ক্ষেতের মুখে পলি' কাব্যের 'একটি গাথা' কবিতাটি সেই হিসাবে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের অন্তর্গত। গ্রিক পুরাণের 'ইডিপাস' চরিত্রটি কবি গ্রহণ করেছেন এক্ষেত্রে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মণিপুরে AFSPA আইনের বলে আসাম রাইফেলসের এক রেজিমেন্ট বৈপ্লবিক সংযোগ থাকার অভিযোগে স্থানীয় বত্রিশ বছরের মহিলা থাঙ্গিয়াম মনোরমাকে গ্রেফতার করে এবং পরবর্তী সময়ে তাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ইম্ফলের রাজপথে নামেন বারোজন মধ্যবয়স্ক নারী। পৌরাণিক কাহিনিতে অজ্ঞানতাবশতঃ মাতৃগমন করেছিলেন ইডিপাস। কিন্তু বর্তমান সময়ে নীতিজ্ঞানের মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছে ইডিপাসকে। তাই নারীর সম্মান লুণ্ঠনে পিছপা নয় তারা—

"ওইখানে ওই প্রচণ্ড রৌরবে,
ডাক দিয়েছে আমার মেয়ের হাড়
যাক উড়ে যাক অঙ্গবসন যাক
যাক পুড়ে যাক হল্‌কা লেগে ছাই
যাদের ওপর পড়ছে এ নিশ্বাস
স্পষ্ট তারা চক্ষু খুলে রাখ্‌
দেখ্‌ রে চেয়ে লক্ষ ইডিপাস
তারপরে যা অন্ধ হয়ে যা
এই চলা আর কোথাও থামার না
আমরা সবাই মনোরমার মা
সবাই আমরা মনোরমার মা"[১৯]

মাতৃত্বের প্রতিভূ নারীর নিষ্পেষণকারী বর্তমানের লক্ষ ইডিপাসের অন্ধত্ব কামনা করেছেন কবি।

'মাটি খোঁড়া পুরনো করোটি' কাব্যের রচনাকাল ২০০৭ থেকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়। সমকালীন ও পূর্ববর্তী সময়ে সমগ্র দেশ সাক্ষী থেকেছে গুজরাটের ধর্মীয় দাঙ্গার নির্মমতা, সিঙ্গুর জমি আন্দোলন ও নন্দীগ্রামের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের। মহাভারতের 'উদ্যোগ পর্ব'-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 'কর্ণের স্বপ্ন' কবিতায় কবি অঙ্কন করেছেন এক মানবতাবিরোধী পৃথিবীর চিত্র। শবের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দেশ। চতুর্দিকে আণবিক অস্ত্রের ঝলকানি। কর্ণের মতোই কবির চোখে ভেসে উঠেছে এক ভবিষ্যত পৃথিবীর দুঃস্বপ্ন, যেখানে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই-

"তখন সে কথা শুনে-সনির্বন্ধ সেই ডাক শুনে
কর্ণ বললেনঃ 'আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যে
ছুঁড়ে দিচ্ছ তুমি এক ভবিষ্যত নতুন পৃথিবী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 17
Website: https://tirj.org.in, Page No. 140 - 149
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যেখানে কোথাও কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই
লাল হয়ে আছে যার ছড়ান সমস্ত জলধারা
হাড়ের উপর হাড় উঁচু করে তুলেছে পাহাড়
জমিয়ে রেখেছে শুধু চারপাশে আণবিক ভার
...”[২০]

২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কবির ‘গোটাদেশজোড়া জউঘর’ কাব্যটি। এই কাব্যের অন্যতম কবিতা ‘সৌপ্তিক পর্ব’, যেখানে কবি গ্রহণ করেছন মহাভারতের পটভূমি। বিশ শতকের রক্তাক্ত সময় অতিক্রম করে একুশ শতকে এক নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি, যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ও মানবাধিকার। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। একুশ শতকের প্রথম দশক থেকেই ভারতবর্ষে দেখা গেছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ধর্মীয় হানাহানি। মহাভারতের ‘সৌপ্তিক পর্ব’–এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে রীতিবিরুদ্ধ ভাবে রাতের অন্ধকারে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে পাণ্ডবদের সন্তানদের হত্যা করেছিলেন অশ্বত্থামা। মুহূর্তের জন্যও সে ভাবেনি এর ফলে অচিরেই ধ্বংস হইয়ে যাবে সমস্ত কুরুবংশের উত্তরপ্রজন্ম। বিরুদ্ধ যুক্তিতে সে বলেছে, পাণ্ডবরাও ন্যায়ের পথে জয়লাভ করেনি, তাই অন্যায়ের বিপক্ষে অন্যায়ের পথই শ্রেয়। একইভাবে ভারতবর্ষেও অরাজক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছেন কবি। মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার নীতিবোধ। অশ্বত্থামার মতোই সংহারে মত্ত হয়ে উঠেছে তারা। মহাভারতের শকুনির মতোই একদল কুচক্রী রাজনৈতিক সুবিধাবাদী দল মদত দিয়ে চলছে তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে। স্বার্থে অন্ধ মানুষ বুঝতে পারছে না তারা যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে তারই আত্মজন–

“আত্মজন? নিদারুণ সংহারসময়ে
তারা কি ভেবেছে আত্মজন? তাদের চলার পথ কেবলই কি
ন্যায়পথ ছিল? কে কবে কখন
ন্যায়পথে যুদ্ধে জেতে বলো? যে শকুন
দূর থেকে লক্ষ্য রেখেছিল কখন বায়সশিশুগুলি
গাছের কোটরে
ঘুমের ভিতরে ধলে পড়ে আর সে-সুযোগে
নিমেষেই প্রতিটিকে ছিন্ন ছিন্ন করে দেওয়া যায় সামান্যত প্রতিরোধহীন
তার পথই যে-কোনো যুদ্ধের পথ।”[২১]

সর্বোপরি বলা যায়, কবি শঙ্খ ঘোষ পাঁচের দশকের কবিতার ধারায় এক ব্যাতিক্রমী সত্তা। তাঁর বৌদ্ধিক উচ্চারণ, দৃঢ় মূল্যবোধ, মৃদু অথচ বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ কবিতায় দুর্লভ। স্বাধীনতা পরবর্তী পাঁচের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা যখন পাশ্চাত্য কাব্য আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতায় প্রচলিত প্রথা ভাঙার সংকল্পে ব্রতী তখন কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় দেখা গিয়েছে ঐতিহ্যের অনুবর্তন। আর্থ-সামজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে মানুষের প্রচলিত মূল্যবোধ যখন বিপর্যস্ত সেই সময়ে কবি অতীত গৌরব ও সংকটের কাহিনিকে আশ্রয় করে মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন নৈতিকতা। অতীত কাহিনির নবমূল্যায়ন ঘটিয়েছেন নব যুগচেতনা প্রকাশের স্বার্থে। সেক্ষেত্রে তাঁর কাব্যে চিত্রিত হয়েছে ঐতিহ্যের অভিনব ব্যঞ্জনা।

Reference:

১. Eliot, T. S., ‘Tradition and Individual Talent’, ’Selected Essays by T.S. Eliot’, 2nd Ed., London, Faber and Faber Ltd, 1934, p. 14
২. ঘোষ, শঙ্খ, ‘কবর’, ‘শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ-১’, নবম সং, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ৪০

৩. ঘোষ, শঙ্খ, 'ভিখারি বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
৪. ঘোষ, শঙ্খ, 'আরুণি উদ্দালক', 'কবিতার মুহূর্ত', ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ৩৩
৫. ঘোষ, শঙ্খ, 'আরুণি উদ্দালক, 'শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ-১', নবম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ১৭৯
৬. ঘোষ, শঙ্খ, 'যাদব', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৭. দাশ, ডঃ নির্মল (সম্পা), '১৪ সংখ্যক পদ', 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', ত্রয়োদশ সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১৫৬
৮. ঘোষ, শঙ্খ, 'মণিকর্ণিকা', 'শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ-১', নবম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ৩০৯
৯. ঘোষ, শঙ্খ, 'বাবরের প্রার্থনা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
১০. ঘোষ, শঙ্খ, 'হাতেম তাই', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮
১১. ঘোষ, শঙ্খ, 'অগস্ত্যযাত্রা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫
১২. ঘোষ, শঙ্খ, 'জতুগৃহ', 'শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ-২', অষ্টম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ৪৮
১৩. ঘোষ, বিনয়, 'বিজ্ঞাপন ও মন', 'মেট্রোপলিটন মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃ. ১৭৬
১৪. ঘোষ, শঙ্খ, 'হেতালের লাঠি', 'শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ-২', অষ্টম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ৯৫
১৫. ঘোষ, শঙ্খ, 'আমাদের এই তীর্থে আজ উৎসব', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
১৬. ঘোষ, শঙ্খ, 'অন্ধবিলাপ', 'কবিতার মুহূর্ত', ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ. ৯৪
১৭. ঘোষ, শঙ্খ, 'অন্ধবিলাপ', 'শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ-২', অষ্টম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ১৬২
১৮. ঘোষ, শঙ্খ, 'দুর্যোধন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
১৯. ঘোষ, শঙ্খ, 'একটি গাথা', 'শঙ্খ ঘোষের কবিতাসংগ্রহ-৩', দ্বিতীয় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মাঘ, ১৪২৭, পৃ. ৫৯
২০. ঘোষ, শঙ্খ, 'কর্ণের স্বপ্ন', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
২১. ঘোষ, শঙ্খ, 'সৌপ্তিক পর্ব', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩